অনুসন্ধানী পাঠ

বিশ্ব প্রেক্ষাপটে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বৈচিত্র্যময় গতিপথ

এই অধ্যায়ে আমরা বিশ্ব পরিপ্রেক্ষিতে মানুষের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবন গঠন ও রুপান্তরের ইতিহাস অনুসন্ধান করে কিছু যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের চেষ্টা করব।

বাংলা অঞ্চলের মানুষের সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বৈচিত্র্যময় গতিপথ আমরা কিছুটা অনুসন্ধান করেছি। সেখানে আমরা দেখেছি, স্থান ও কাল ভেদে মানুষ নানান বৈচিত্র্য এবং ভিন্নতা নিয়ে সমাজ ও সংস্কৃতি গঠন করেছে। হাজার বছরের ইতিহাসে সামাজিক রীতি-নীতি, প্রথা-পদ্ধতি আর সাংস্কৃতিক আচার-অনুষ্ঠানের সঙ্গে নতুন নতুন উপাদান যুক্ত হয়েছে। আবার অনেক উপাদান সময়ের সঙ্গে সঙ্গে হারিয়ে গেছে। এর ফলে সমাজের গঠন প্রক্রিয়ায় এসেছে নানান পরিবর্তন ও বিবর্তন। তৈরি হয়েছে নানান ধরনের বৈচিত্র্য ও বহুত্ব। এই যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন হয় তার ফলে সেই সমাজের মানুষের অবস্থান এবং ভূমিকাতেও আসে নানান পরিবর্তন।

চলো, আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা এবং পূর্ববর্তী পাঠের আলোকে দু'টি ভিন্ন সময়ে এবং ভিন্ন ধারার সমাজে একজন ব্যক্তির অবস্থান ও ভূমিকা কেমন হতে পারে, সেই বিষয়ে একটি আলোচনা করি। কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে এই আলোচনা পর্বটি আমরা কার্যকর করতে পারি।

আলোচনার শেষে নিচের ছকটি পূরণ করি-

শিকার ও সংগ্রহ যুগে একজন মানুষ কীভাবে জীবন যাপন করত?	২০২৪ সালে যেকোনো শহরে বসবাস করে এমন একজন মানুষ কীভাবে জীবন যাপন করছে?
শিকার ও সংগ্রহ যুগে একজন মানুষের জীবন যাপন ছিল খুবই কঠিন এবং চ্যালেঞ্জিং। তারা প্রকৃতির সাথে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয়েছিল এবং তাদের জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে বিপদ ছিল। আদিম মানুষরা ছিল শিকারী-সংগ্রাহক।	২০২৪ সালে যেকোনো শহরে বসবাস করে একজন মানুষের জীবনযাপন তুলনামূলক সহজ।বর্তমানে মানুষ নিজের সুবিধার জন্য অনেক ধরনের আধুনিক প্রযুক্তি আবিস্কার করেছে।তারা যাতায়াতের জন্য বাস,রিক্সা ইত্যাদি ব্যবহার করে।

তারা খাবারের জন্য শিকার করত এবং ফল, শাকসবজি এবং অন্যান্য উদ্ভিদ সংগ্রহ করত। তারা সাধারণত ছোট ছোট দলে বাস করত এবং তাদের বসতি ছিল গুহা, গাছের ডাল বা অন্যান্য প্রাকৃতিক আশ্রয়স্থলে।আদিম মানুষের জীবন ছিল খুবই সহজ। তাদের কাছে কোনও প্রযুক্তি বা সরঞ্জাম ছিল না। তারা হাত দিয়ে জিনিসপত্র তৈরি করত এবং আগুন ব্যবহার করত। তারা সাধারণত পোশাক পরত না এবং তাদের শরীরে শুধুমাত্র গাছপালার পাতা বা চামড়া ব্যবহার করত।আদিম মানুষের জীবন ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ। তারা শিকারী, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং রোগের দ্বারা বিপন্ন ছিল। তাদের গড় আয়ু ছিল প্রায় **30** বছর।	বর্তমানে মানুষের খাবারের জন্য শিকার করতে হয় না।নানা ধরনের প্যাকেটজাত খাবার খুব সহজে পাওয়া যায়।মানুষ এখন বসবাসের জন্য বাড়িঘর নির্মান করেছে।বড় বড় ইমারত তৈরি করেছে।পরিধান করার জন্য নতুন নতুন পোশাক ব্যবহার করে।অসুস্থ হলে চিকিৎসার জন্য নতুন যন্ত্র ব্যবহার করে যার ফলে সহজে রোগ নির্নয় করা যায়।আগের তুলনায় বর্তমান মানুষের গড় আয়ু বেড়েছে।

প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতায় সমাজ ও সংস্কৃতি

মিশরীয় সভ্যতা হচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রাচীনতম সভ্যতাগুলোর অন্যতম। আফ্রিকা মহাদেশের উত্তর-পূর্বদিকে নীল নদের তীরে আজ থেকে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে সভ্যতাটির উদ্ভব হয়। প্রাচীন নগরভিত্তিক সমাজ কাঠামোর পূর্ণাঙ্গ রূপ দেখা গিয়েছিল মিশরীয় সমাজব্যবস্থায়।

মিশরীয় সমাজে মানুষ তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। উচ্চ শ্রেণিতে অবস্থান করত- ফারাও বা শাসকগণ, অভিজাত অমাত্যগণ, পুরোহিত, বিত্তবান ভূমিমালিকেরা। দ্বিতীয় শেণিতে অবস্থান করত- বণিক, কারিগর, শ্রমশিল্পীসহ বিভিন্ন স্বাধীন পেশার মানুষেরা। যে কৃষিকে কেন্দ্র করে সভ্যতার অগ্রযাত্রার সূচনা হয়েছিল, সেই কৃষকেরা ছিলেন তৃতীয় শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। মিশরে অধিকাংশ কৃষকের নিজের জমি ছিল না। কৃষকেরা তাই ভূমিদাস হিসেবে বিত্তবান ভূমি-মালিকদের জমিতে কাজ করতে বাধ্য থাকতেন। প্রাচীন মিশরীয় সমাজের সকল সুবিধা ভোগ করতেন রাজা, পুরোহিত এবং অভিজাত শ্রেণির মানুষেরা। রাজাকে সেখানে বলা হতো ফারাও। সমাজ ব্যবস্থার একেবারে উপরে অবস্থান করতেন ফারাওগণ।

মিশরীয়দের প্রাচীন ইতিহাসে সমাজ ব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল পরিবার। পারিবারিক সম্পত্তির ওপর মেয়েদের অধিকার স্বীকৃত ছিল। নারীদের সামাজিক মর্যাদা ছিল খুবই উঁচু অবস্থানে। মিশরের রাণীকে দেবতার স্ত্রী, মা, কন্যা বলে বিবেচনা করা হতো। রাজবংশের মেয়েরাও সিংহাসনের দাবিদার ছিল এবং অনেকেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিতও হতো। মিশরের একজন রাণীর নাম হচ্ছে নেফারতিতি। তিনি ছিলেন রাজা আখেনাতেনের স্ত্রী।

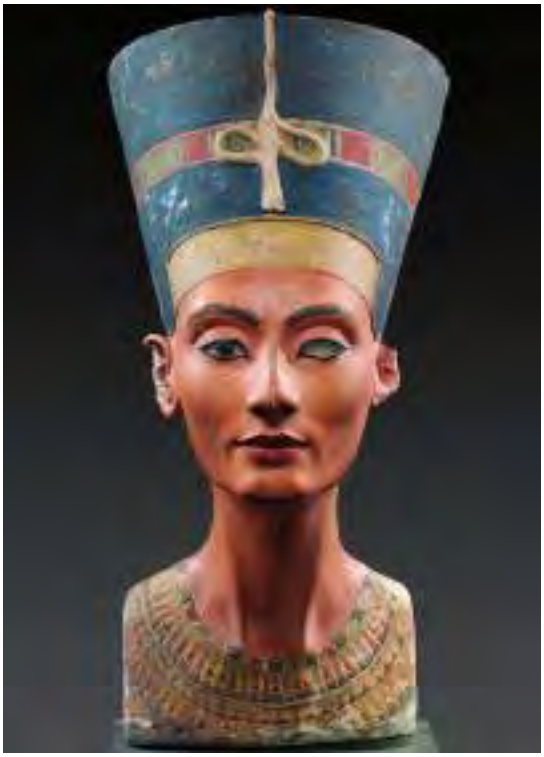

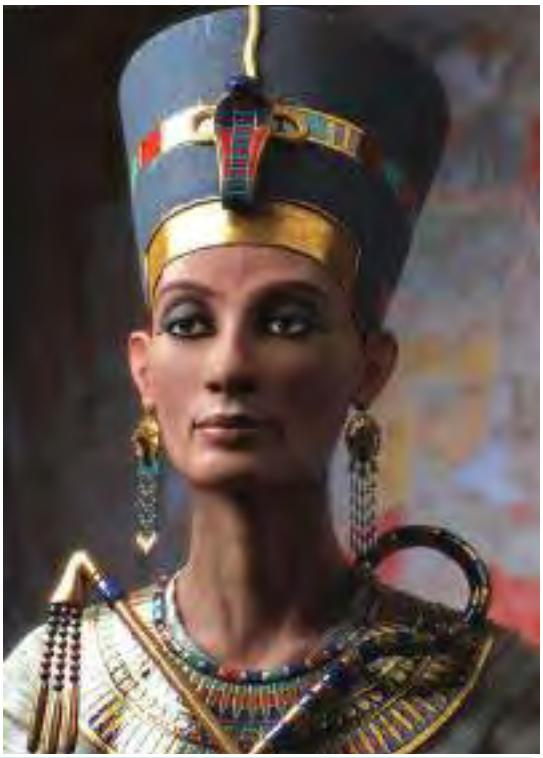

প্রাচীন মিশরেই প্রথম সিংহাসনের দাবিদার হিসেবে নারীদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ কাজেও নারীরা অংশ নিতেন। মিশরের রাজা আখেনাতেনের স্ত্রী রাণী নেফারতিতি ছিলেন তেমনই একজন প্রভাবশালী নারী। রাজা আখেনাতেন এবং তাঁর স্ত্রী নেফারতিতি মিশরীয়দের জীবনযাপনে বড়ো পরিবর্তন নিয়ে এসেছিলেন। প্রথম ছবিতে রানী নেফারতিতির ভাস্কর্য এবং দ্বিতীয় ছবিতে শিল্পীর কল্পনায় নেফারতিতির চেহারার পুনর্গঠিত চিত্র।

সাংস্কৃতিক ইতিহাসে মিশরীয়দের অত্যন্ত উজ্জ্বল ও বহুবিচিত্র অবদানের নজির পাওয়া যায়। মিশরীয়দের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ওপর ধর্মের প্রভাব ছিল প্রবল। তারা বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক শক্তি (যেমন: সূর্য, চন্দ্র, ঝড়, প্লাবন, বাতাস প্রভৃতি) এবং পশুপাখির (যেমন: সিংহ, বাঘ, সাপ, বাজপাখি, কুমির, বিড়াল প্রভৃতি) পূজা করত। মিশরীয় প্রধান দেবতা ছিল সূর্য দেবতা। সূর্য দেবতার নাম ছিল ‘আমান রে’।

মিশরের শাসকদের উপাধি ছিল ফারাও। শাসক এবং পুরোহিতেরা মানুষের মধ্যে এই বিশ্বাস গেঁথে দিয়েছিল যে, ফারাওগণ দেবতাঁদের বংশধর। পরকালেও ফারাওগণ শাসকের মর্যাদা ফিরে পাবে। মৃত্যুর পর ফারাওদের দেহ যাতে পচে নষ্ট না হয়ে যায় সেই জন্য বিশেষ কায়দায় তাঁদের দেহ মমি করা হতো। পিরামিড নামে এক ধরনের অতিকায় স্থাপনার মধ্যে এসবমমি রাখা হতো। মমিকরণ প্রক্রিয়া এবং পিরামিড নির্মাণ কৌশলে মিশরীয়দের স্থাপত্যশৈলী এবং শরীরবিদ্যা সম্পর্কে উন্নত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

পিরামিড তৈরির বিভিন্ন ধাপ:

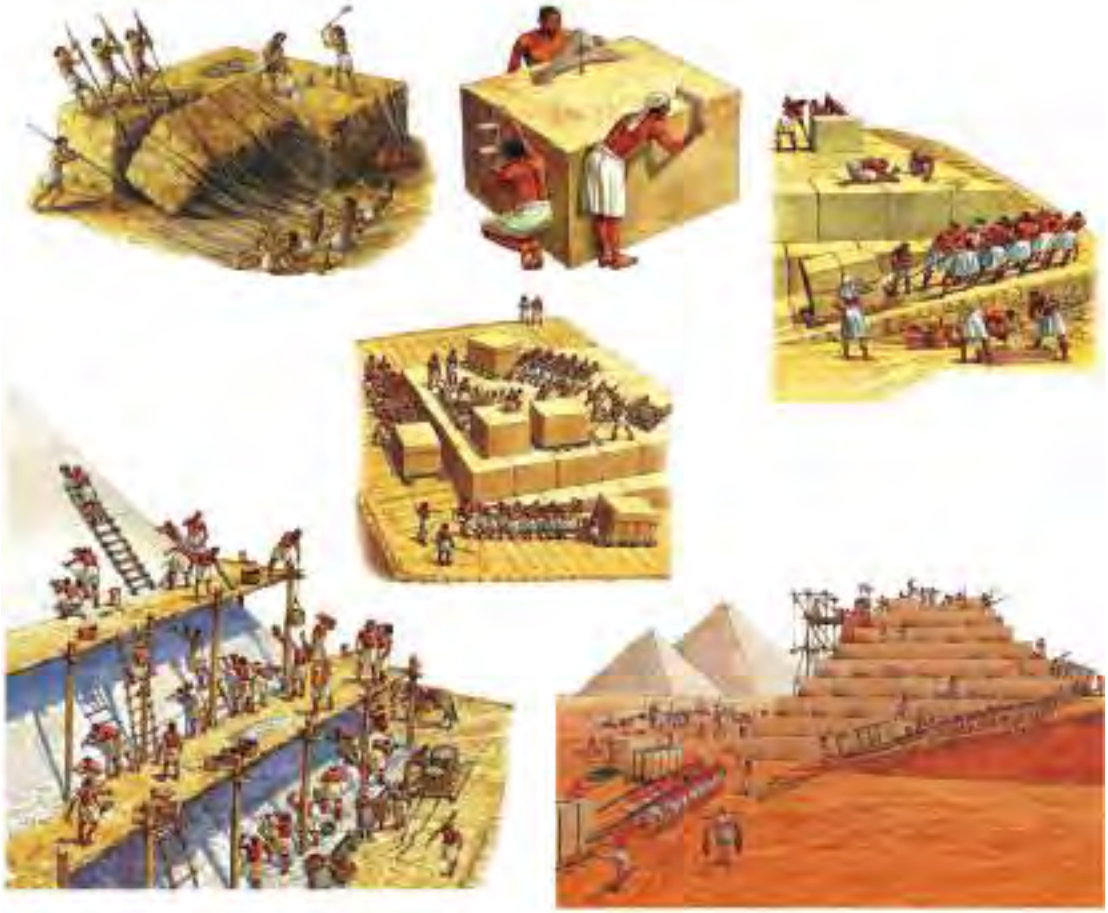

পিরামিডের ভিতরের দেখতে কেমন ছিল।

পিরামিড নির্মাণের বিভিন্ন ধাপ :
পাথর মেপে, কেটে দরকারী আকার দিয়ে পিরামিড তৈরির উপযোগী করা হত। একটা পাথরের উপরে আরেকটা পাথরের টুকরো বসানো হত। দড়ি দিয়ে টেনে বেঁধে উপরের দিকে পাথরের টুকরাগুলোকে উঠানো হত। একটার উপরে আরেকটা স্থাপন করা হত। পিরামিড তৈরির এই প্রক্রিয়ার প্রচুর শ্রমিক দরকার হত। গবেষকগণ মনে করেন, বড় আকারের একটা পিরামিড তৈরি করতে ২৫০০০ থেকে ৩০০০০ জন শ্রমিক প্রয়োজন হত। এই শ্রমিকগণের থাকার ও খাওয়ার ব্যবস্থা করা হত নির্মাণ স্থানের কাছে। উপরের ছবি এই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন ধাপ কল্পনা করে আঁকা হয়েছে।

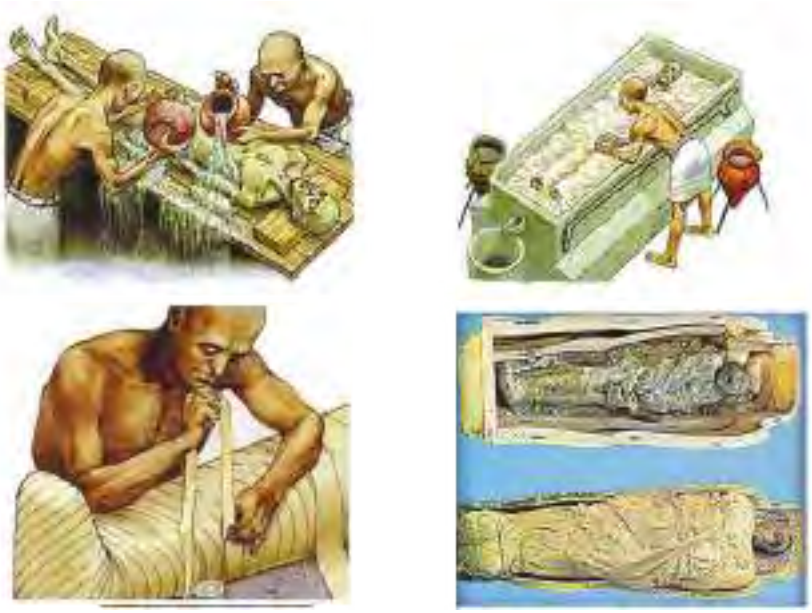

মৃতদেহকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় রুপান্তর, পরিবর্তন, রাসায়নিক ব্যবহার করে কাপড়ের পরতে পরতে আবৃত করে কয়েকটি ধাপে অনেক সময় ধরে মমিতে পরিণত করা হতো। উপরের ছবিতে তেমনই কয়েকটি ধাপ গবেষণার মাধ্যমে পুনর্গঠন করা হয়েছে।

সাহিত্য, বিজ্ঞান, দর্শন, শিল্পকলায় মিশরীয় সভ্যতা প্রভূত উন্নতি সাধন করেছিল। কৃষির ওপর ভিত্তি করেই মিশরীয় সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। নীল নদের বন্যা, খরা প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে আকাশের নক্ষত্ররাজির সম্পর্ক লক্ষ করেই তারা জ্যোতির্বিদ্যা চর্চায় মনোনিবেশ করেছিল। কৃষি এবং ধর্মীয় প্রয়োজন থেকে তারা চন্দ্রপঞ্জিকার উদ্ভাবন করেছিল। আকাশে চন্দ্রের অবস্থান নিরীক্ষণ করে রচিত হয়েছিল চন্দ্রপঞ্জিকা। এই পঞ্জিকা অনুসারে বছরে তাঁদের দিনের সংখ্যা ছিল ৩৫৪টি। আনুমানিক ৪২০০ সাধারণ পূর্বাব্দের দিকে মিশরীয়রা সূর্যকে পর্যবেক্ষণ করে ৩৬৫ দিনে বছর হিসাব করে সৌর পঞ্জিকা তৈরি করে। ৩০ দিনে ১ মাস, ১২ মাসে বছরের হিসাব মিশরীয়রাই প্রথম আবিষ্কার করেছিল। শুধু তাই নয়, নীলনদের বন্যার সঙ্গে বছরের হিসাবে মিলাতে গিয়ে তাঁরাই প্রথম 'লিপ ইয়ার' আবিষ্কার করে প্রতি চার বছর পরপর ৩৬৬ দিনে বছর গণনার রীতি চালু করে। দিনের বিভিন্ন সময় নিরূপণের জন্য তারা একধরনের সূর্যঘড়ি আবিষ্কার করেছিল।

গণিতের ক্ষেত্রেও তাঁদের অবদান ছিল অনেক। যোগ, বিয়োগ, গুণ পদ্ধতির উদ্ভাবন করেছিল তারা। জ্যামিতিক হিসাব ও নকশা মিলিয়ে নির্মাণ করেছিল সে যুগের শ্রেষ্ঠতম বেশকিছু স্থাপত্যকীর্তি। এসব কীর্তি ইতিহাসের এক বিশেষ কালে নির্দিষ্ট একভূখণ্ডে একদল মানুষের জীবন-সংগ্রাম আর সভ্যতা রচনার অভিজ্ঞতাকে আজও ধারণ করে আছে।

ইতিহাসে মিশরীয় সভ্যতার অন্যতম বড়ো অবদান হচ্ছে লিপির আবিষ্কার। মানুষের ইতিহাসে তাঁরাই প্রথম লিপির উদ্ভাবন করে। প্রথম দিকে তাঁদের লিপি ছিল চিত্রভিত্তিক। কোনো একটি বস্তুর নাম ও সংখ্যা লিখে রাখার জন্য তারা সে বস্তুটির চিত্র আঁকত এবং ছোটো ছোটো বিন্দু দিয়ে তার সংখ্যা উল্লেখ করত। চিত্রভিত্তিক

সেই লিপিকে বলা হয় হায়ারোগ্লিফিক। হায়ারোগ্লিফিক নামটি গ্রিকদের দেওয়া। এর অর্থ হচ্ছে, পবিত্র খোদাই কর্ম। চিত্রভিত্তিক লিপি থেকেই তারা ক্রমে ক্রমে অক্ষরভিত্তিক লিখনপদ্ধতি আবিষ্কার করে। লেখার উপকরণ হিসাবে মিশরীয়রা প্যাপিরাস নামক কাগজ এবং কালো কালির আবিষ্কার করেছিল। প্যাপিরাস ছিল মূলত একধরনের নলখাগড়া জাতীয় উদ্ভিদ। প্যাপিরাসের কাণ্ডকে খুব পাতলা করে কেটে রঙে ডুবিয়ে, রোদে শুকীয়ে লেখার উপযোগী করা হতো।

প্রাচীন মেসোপটেমিয়া সভ্যতায় সমাজ ও সংস্কৃতি

আনুমানিক ৪০০০ সাধারণ পূর্বাব্দ থেকে বর্তমান ইরাকের টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে ধারাবাহিকভাবে কতগুলো নগর সভ্যতার জন্ম হয়েছিল। এগুলোর মধ্যে সুমেরীয়, ব্যাবিলনীয়, এসেরীয়, ফনেশীয় এবং ক্যালডীয় সভ্যতার নাম উল্লেখযোগ্য। ইতিহাসে এই সভ্যতাগুলোর সমন্বিত নাম মেসোপটেমীয় সভ্যতা। ভূ-পৃষ্ঠের ভিন্ন ভৌগোলিক বাস্তবতায় ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গড়ে উঠা এই নগর সভ্যতাগুলোতেও মিশরীয় সভ্যতার মতোই শ্রেণিভিত্তিক সমাজ গড়ে উঠেছিল। রাজা ছিলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। রাজাদের এই ক্ষমতাকে আরও বেশি শক্তিশালী করেছিল পুরোহিত বা ধর্মগুরুরা। রাজাকে তারা ক্ষেত্রবিশেষে ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলে পরিচয় করিয়ে দিতেন। অন্যান্য শ্রেণির মানুষের সামাজিক অবস্থান ছিল অনেক নিচে। সমাজে দাস প্রথার প্রচলন ছিল। ভূমিদাস ও ক্রীতদাসদের অবস্থান ছিল সবচেয়ে নিচের শ্রেণিতে।

মেসোপটেমিয়া অঞ্চলে গড়ে উঠা সভ্যতাগুলোর মধ্যে সুমেরীয় এবং ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় মেয়েরা সম্পদের অধিকারী হতে পারতো এবং স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্য করার অধিকার তাঁদের ছিল। অন্যদিকে একই অঞ্চলে গড়ে উঠা এসেরীয় সভ্যতায় মেয়েদের সেই অধিকার ছিল না। ক্যালডীয় সভ্যতায়ও মেয়েদের অধিকার ছিল অত্যন্ত সীমিত।

মেসোপটেমিয়া সভ্যতার অগ্রদূত বলা হয় সুমেরীয় সভ্যতাকে। ইতিহাসে তাঁদের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। ৩০০০ সাধারণ পূর্বাব্দে সুমেরীয়রা কীউনিফর্ম নামের এক ধরনের লিখন পদ্ধতি আবিষ্কার করে। কাদামাটির নরম প্লেটের ওপর সরু কাঠির অগ্রভাগ দিয়ে অক্ষর ফুটিয়ে তোলা হতো। পরে তা রোদে শুকীয়ে বা আগুনে পুড়িয়ে সংরক্ষণ করা হতো। সুমেরীয়রা ছিল সাহিত্যপ্রেমি। আনুমানিক ২০০০ সাধারণ পূর্বাব্দে তারা ‘গিলগামেশ’ নামে একটি মহাকাব্য রচনা করেছিল। গিলগামেশ কাব্যে মহাপ্লাবন এবং সৃষ্টিতত্ত্ব সংক্রান্ত এমনঅনেক কিছুই বলা হয়েছে যা পরবর্তীকালে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত হতে দেখা যায়।

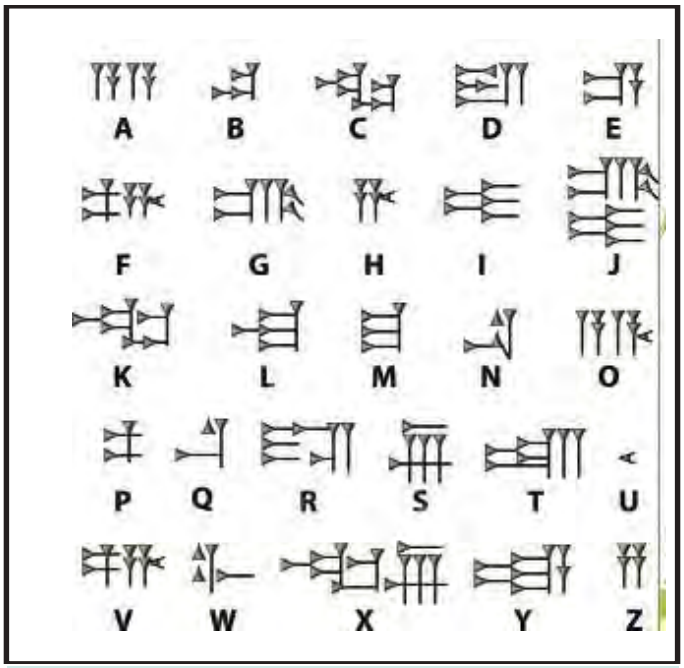

ইংরেজি বর্ণমালা অনুসারে কীউনিফর্ম লিপি

সুমেরীয় সভ্যতায় প্রথম চাকাচালিত যানবাহনের প্রচলন হয়। স্থাপত্যক্ষেত্রেও সুমেরীয়দের অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য। সুমেরীয়দের স্থাপত্যবিদ্যার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি ছিল জিগুরাত নামের ধর্মমন্দির।

উর থেকে প্রাপ্ত চিত্রে অঙ্কীত যানবাহনে চাকার ব্যবহার For Video https://www.khanacademy.org/humanities/history/ancient-medieval/Ancient/v/standard-of-ur-c-2600-2400-b-c-e

সুমেরীয়দের প্রতিটি নগরকেন্দ্রে একটি নগরদেবতার নামে উৎসর্গ করা মন্দির ছিল। এই মন্দিরগুলোকে জিগুরাত বলা হতো। উর নগরের জিগুরাতটি তখন দেখতে কেমন ছিল? সেই মন্দিরের কাল্পনিক ছবি। কপিরাইট : জ্যঁ ক্লদগোলভিন (https://jeanclaudegolvin.com/en/project/middle-east/

ইতিহাসে মিশরীয়দের মতোই সুমেরীয় এবং ব্যাবিলনীয় সভ্যতায় গণিত, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকীৎসাশাস্ত্রে বিশেষ উন্নতি সাধিত হয়েছিল। সুমেরীয়রাই প্রথম '৭ দিনে এক সপ্তাহ' এবং '২৪ ঘন্টায় দিন'-এর নিয়ম প্রবর্তন করে। সভ্যতায় ব্যাবিলনীয়দের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে আইনের ক্ষেত্রে। হাম্মুরাবী নামে ব্যাবিলনীয় একজন যোদ্ধা ও সংগঠক স্থানীয় রীতিনীতি এবং প্রথাপদ্ধতির পরিবর্তে একটি সর্বজনস্বীকৃত বিধিবদ্ধ আইন সংকলন ও প্রণয়ন করেন। হাম্মুরাবীর আইনের ধারায় বিয়ে, ব্যবসা-বাণিজ্য, পরিবার, সম্পত্তি, কৃষি, দাস ক্রয়-বিক্রয় সহ প্রায় সকল প্রকার অপরাধের মীমাংসা সম্পর্কীত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

প্রাচীন গ্রিসে সমাজ ও সংস্কৃতি

পৃথিবীর অন্যান্য অধিকাংশ সভ্যতা গড়ে উঠেছিল নদীকে আশ্রয় করে। গ্রিক সভ্যতা ছিল সেই ধারায় একটি ব্যতিক্রমী উদাহরণ। গ্রিক সভ্যতা গড়ে ওঠার পেছনে নদীর চেয়ে সমুদ্রের অবদান ছিল বেশি। গ্রিক সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল পর্বত এবং সমুদ্রবেষ্টিত দ্বীপপুঞ্জ। অনেকগুলো ছোটো ছোটো দ্বীপের সমন্বয়ে অপেক্ষাকৃত অনুর্বর পার্বত্য অঞ্চলে আনুমানিক ১২০০ সাধারণ পূর্বাব্দে সভ্যতাটির যাত্রা শুরু হয় এবং ৬০০ সাধারণ অব্দের দিকে এসে পূর্ণমাত্রায় বিকাশ লাভ করে। অনেকগুলো ছোটো ছোটো নগর নিয়ে এই সভ্যতা বিকশিত হয়েছিল। গ্রিসের প্রধান নগর ছিল এথেন্স। গণতন্ত্রের সূতিকাগার হিসাবে এথেন্সের নাম ইতিহাসের পাতায় বিশেষভাবে লিখিত হয়ে আছে।

প্রাচীন মিশর এবং মেসোপটেমিয়ার মতো গ্রিসেও শ্রেণি বিভক্ত সমাজব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। গ্রিক সমাজ মূলত অভিজাত এবং শোষিত এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত ছিল। অভিজাতরা ছিল সকল সম্পদ এবং প্রশাসনিক সুবিধার অধিকারী। দাস এবং শ্রমিকেরা তাঁদের হাতে শোষিত ও নির্যাতিত হতো। কৃষি এবং বাণিজ্য ছিল গ্রিকদের অর্থনীতির মূল ভিত্তি। গম ও যব ছিল তাঁদের প্রধান কৃষিপণ্য। তবে অধিকাংশ ভূমি অনুর্বর হওয়ায় বাইরে থেকে খাদ্য আমদানি করতে হতো। কৃষকেরা তাই অধিকাংশ সময়ে দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনযাপন করত। সম্পদের মূল মালিকানা থাকত অভিজাত শাসক ও বণিকদের হাতে।

সে সময়ের অন্যতম প্রধান নগর-রাষ্ট্র এথেন্সের নগরের মূল কেন্দ্র বা অ্যাক্রোপলিসের বর্তমান আলোকচিত্র
(Source: history৪kids.co)

এথেনিয়ান অ্যাক্রোপলিস: দেবী এথেনার পার্থেনন মন্দির (Source: history4kids.co)
গ্রিস সভ্যতার আরেকটি নগর-রাষ্ট্র ক্রিটের সেই সময়ের চিত্র কল্পনা করা হয়েছে।

সমুদ্রকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছিল গ্রিক সভ্যতা। বিভিন্ন দ্বীপ এবং নগরগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য জাহাজ নির্মাণে বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছিল গ্রিকরা। নৌযুদ্ধেও তারা ছিল প্রায় অপরাজেয়। বিভিন্ন প্রতিবেশী রাজ্যে আক্রমণ করতে তারা যুদ্ধ জাহাজ ব্যবহার করত। আবার গ্রিক নগর রাষ্ট্রগুলোর মধ্যেও প্রায়ই যুদ্ধ-বিগ্রহ লেগে যেত। নিচে গ্রিকদের কয়েকটি যুদ্ধ জাহাজ এবং গ্রিকদের সঙ্গে পারসিকদের যুদ্ধের কাল্পনিক চিত্র দেওয়া হয়েছে। ছবিগুলো দেখে তোমরা সেই সময়ের গ্রিকদের জাহাজ নির্মাণের দক্ষতা এবং যুদ্ধকালীন সময়ে ব্যবহৃত অস্ত্র ও বর্ম সম্পর্কে ধারণা পাবে।

গ্রিক সভ্যতার ইতিহাসের কোনো কাহিনিই পুরোপুরি বোঝা যাবে না যদি সমুদ্রের সঙ্গে গ্রিকদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আমরা না জানি। দ্বীপরাষ্ট্র হিসেবে বিভিন্ন দ্বীপের মধ্যে যোগাযোগ আর যুদ্ধের জন্য গ্রিকরা নৌযুদ্ধের বিভিন্ন জাহাজ ও কৌশল আবিষ্কার করেছিল। অন্যান্য অঞ্চলের সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগের জন্যও তারা বিভিন্ন ধরনের সমুদ্রগামী জাহাজ ব্যবহার করত। জাহাজ নির্মাণ ও চালনায় গ্রিকরা অত্যন্ত দক্ষ ছিল। জাহাজকে ট্রিয়েম বলা হতো। বিভিন্ন লিখিত সূত্রে জানা যায় যে, তারা বিভিন্ন জাহাজের ভিন্ন ভিন্ন নাম দিত। বেশির ভাগ নামই দেবতা-দেবী, স্থান, প্রাণী, বস্তু বা ধারণার (যেমন: স্বাধীনতা, গৌরব, সাহস ইত্যাদি) নামে হতো।

নৌযুদ্ধ

যুদ্ধজাহাজের বহর

বড়ো জাহাজ ও নৌকা মিলিয়ে যুদ্ধের জন্য তৈরি করা নৌবহর

অনুশীলনী

প্রাচীন গ্রিস ও আমাদের দেশের কাঠের জাহাজের পার্থক্য খুঁজে বের করো। মিল অমিল লেখ।

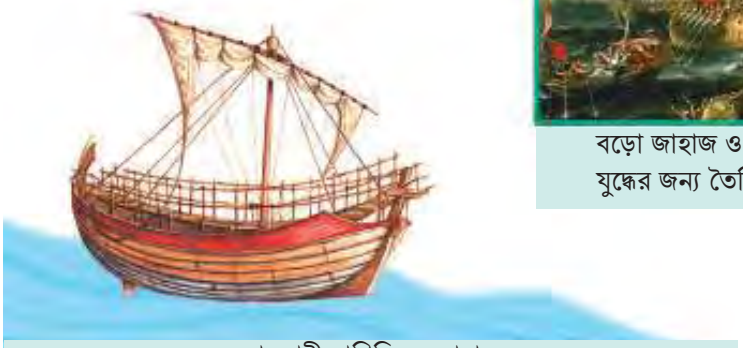

মালবাহী বাণিজ্যিক জাহাজ

গ্রিকদের ধর্মীয় জীবন ছিল বহু দেব-দেবীতে পূর্ণ। প্রতিটি নগরের পৃথক দেবতা ছিল। তবে তাঁদের প্রধান দেবতা ছিল জিউস। জিউজ ছিল বজ্র, বৃষ্টি এবং আকাশের দেবতা।

স্থাপত্য, ভাস্কর্য, সাহিত্য, দর্শন, নাট্যকলা, খেলাধুলা, রাজনীতি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় গ্রিক সভ্যতার অবদান সমকালীন অন্য সকল সভ্যতাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তোমাদের জেনে রাখা দরকার যে, ইতিহাসের জনক হিসাবে পরিচিত হেরোডোটাসের জন্ম গ্রিসে। গ্রিক ও পারসিক যুদ্ধের ঘটনাকে অবলম্বন করে তিনিই প্রথম ইতিহাস-সংক্রান্ত বই রচনা করেন। ইতিহাস চর্চায় সঠিক উৎস অনুসন্ধান এবং ঘটনার বর্ণনায় নিরপেক্ষ থাকার কথা বলেন। সক্রেটিস, প্লেটো ও এরিস্টটলের মতো খ্যাতিমান দার্শনিক এবং পিথাগোরাসের মতো প্রতিভাবান গণিতবিদের জন্ম হয়েছিল প্রাচীন গ্রিসে। গ্রিকরাই প্রথম পৃথিবীর মানচিত্র অংকন করে। বলা হয়ে থাকে, গ্রিক সভ্যতা শুধু ইউরোপকে নয়, পুরো পৃথিবীকেই জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-সাহিত্য ও দর্শনের জ্ঞান দিয়ে ইতিহাস রচনা করেছে।

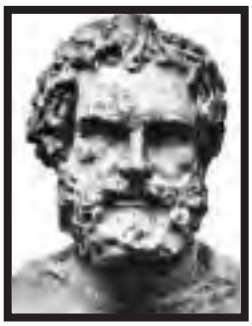
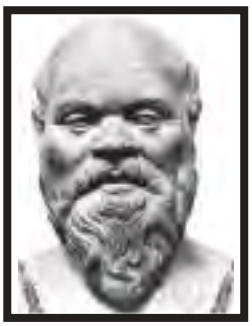
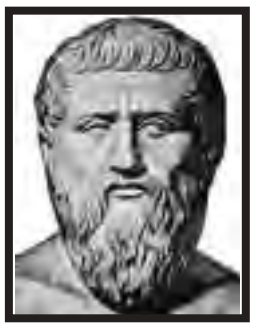

সেই সময় জ্ঞান ও বিজ্ঞানের চর্চা হতো গ্রিসের বিভিন্ন নগর-রাষ্ট্রে। অনেক গ্রিক চিন্তাবিদের প্রভাব গণিত-দর্শন-বিজ্ঞান-জ্যোতির্বিজ্ঞান-চিকীৎসাবিজ্ঞানে পড়েছে। তারা চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। এমনই চারজন চিন্তাবিদের ভাস্কর্যের ছবি এখানে রয়েছে। বাঁম থেকে ডানে: থেলিস (প্রাক্ সাধারণ ৬২৩-৫৪৫ অব্দ); সক্রেটিস (প্রাক্ সাধারণ ৪৭০-৩৯৯ অব্দ); প্লেটো (প্রাক্ সাধারণ ৪২৭-৩৪৭ অব্দ) অ্যারিস্টটল (প্রাক্ সাধারণ ৩৮৪-৩২২ অব্দ);

প্রাচীন মিশর, মেসোপটেমিয়া ও গ্রিক সভ্যতার সমাজব্যবস্থা নিয়ে দলগত আলোচনার মাধ্যমে বিভিন্ন পেশার মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা নির্ণয় করে নিচের ছকটি পূরণ করি।

	বিভিন্ন পেশার মানুষের অবস্থান	ভূমিকা
প্রাচীন মিশরীয় সমাজ	**শাসক,কারিগর,কৃষক**	শাসকরা রাজ্য শাসন করতেন।কারিগর রা ব্যবসা পরিচালনা করতেন।কৃষকরা মালিকের জমিতে কাজ করতেন।
গ্রিক সভ্যতা	**শাসক,পুরোহিত,চিকিৎসক, ক্রীতদাস,কৃষক।**	শাসক,পুরোহিতরা জমির মালিকানা ভোগ করতেন।কৃষক এবং ক্রীতদাস তাদের সেবা করতেন।
মেসোপটেমিয়া সভ্যতা	**অভিজাত শাসক, যোদ্ধা,নাবিক,শ্রমিক,দাস**	অভিজাত শাসকরা বিভিন্ন জাতির সাথে বানিজ্য পরিচালনা করতেন।শ্রমিক,দাসরা মজুর খাটা কাজ করতেন।

বিভিন্ন সময়	বিভিন্ন সমাজ	রাজনৈতিক অবস্থা
পঞ্চম শতক	**রোমান সাম্রাজ্য, সামন্ততন্ত্র**	পূর্ব রোমান সাম্রাজ্যের অবসান হয়। রোমান সাম্রাজ্যবাদের এই পতনের ফলে সমাজ ব্যবস্থাতেও বড় পরিবর্তন আসে। সামন্তবাদের উদ্ভব হয়। এ সময় রোমসহ ইউরোপের বিভিন্ন অংশে খ্রিস্ট ধর্মের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটে
সপ্তম শতক	**মুসলিম ধর্মীয় ব্যবস্থা, পারস্য সাম্রাজ্য**	আরবের মক্কা থেকে ইসলাম ধর্মের অভ্যুদয়, প্রচার ও প্রসার ঘটে। বহু গোত্র এবং জনধারার মানুষে বিভক্ত আরবভূমির সুনির্দিষ্ট অংশে নতুন এই ধর্মের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে ইসলামি সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থার প্রকাশ ঘটে।
দশম শতক	**ইউরোপ কেন্দ্রিক খ্রিস্ট ধর্মীয় সমাজ, মধ্যপ্রাচ্য কেন্দ্রিক ইসলাম ধর্মীয় সমাজ, চীনা সাম্রাজ্য, রাষ্ট্রকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থার উদ্ভব**	ইউরোপ এবং মধ্যপ্রাচ্যে খ্রিস্টান ধর্ম এবং ইসলাম ধর্ম পৃথক পৃথকভাবে আবির্ভূত হয়। খ্রিস্টান এবং মুসলিমরা পৃথক রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত হয়। দীর্ঘমেয়াদী ধর্মযুদ্ধ 'ক্রুসেড' সংঘটিত হয়।

রেনেসাঁ: পুনর্জাগরণের কাল

রেনেসাঁ একটি ফরাসি শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে পুনর্জাগরণ বা নবজাগরণ। ইতিহাসে ঘটে যাওয়া অন্যতম প্রধান ঘটনা এই রেনেসাঁ। রেনেসাঁর প্রভাবে আজও পৃথিবীর মানুষ যৌক্তিক এবং বিজ্ঞানসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের পথে হেঁটে চলেছে। ১৪৯৩ সালে বা সাধারণ অব্দে তুরস্কের শাসকগণ রোমান সাম্রাজ্যের পশ্চিম দিকের কেন্দ্র কনস্টান্টিনোপল দখল করে নেন। কনস্টান্টিনোপলের পণ্ডিত, শিল্পী এবং চিন্তকগণ তখন ইতালিতে গিয়ে আশ্রয় নেন। ইতালির উপদ্বীপগুলোতেও অনেক শিল্পী, পণ্ডিত ও চিন্তকেরা নতুন চিন্তার বিকাশ ঘটাচ্ছিলেন। কনস্টান্টিনোপল থেকে আগত পণ্ডিত ও শিল্পীদের সঙ্গে ইতালির পণ্ডিতদের জ্ঞান ও দর্শনের মিলন হয়। এর ফলে শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, সমাজ ও সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রে নবজাগরণ বা নতুন চিন্তার ক্ষেত্র তৈরি হয়। ইতিহাসে এই ঘটনাটিকেই রেনেসাঁ বা নবজাগরণের কাল বলে অভিহিত করা হয়।

ইউরোপে খ্রিস্টধর্ম বিস্তারের পর থেকে প্রায় এক হাজার বছরের জন্য ইউরোপের সমাজ, সংস্কৃতি, রাষ্ট্র- সকল কিছুর ওপর ধর্মের একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শিল্প, সাহিত্য, দর্শনের ক্ষেত্রেও স্থবিরতা নেমে আসে। এর ফলে ইহজাগতিক জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় ভাঁটা পড়ে এবং প্রাচীন গ্রিসের স্বর্ণযুগের বিজ্ঞান, দর্শন ও অন্যান্য জ্ঞানের সঙ্গে ইউরোপের সংযোগ ছিন্ন হয়ে যায়। পনের শতকে বোকাচ্চিও, পেত্রার্ক প্রমুখ মানবতাবাদী সাহিত্যিকগণ ধর্মীয় প্রভাবকে পাশ কাটিয়ে নতুন ধারার চিন্তাভাবনার চর্চা করছিলেন।

এই সংযোগ পুনরায় স্থাপিত হয়েছে মূলত অনুবাদের মাধ্যমে। অনুবাদ হয়েছিল প্রাচীন গ্রিক থেকে প্রথমে আরবিতে। তারপর ল্যাটিন ভাষায়। এ কাজে যুক্ত হয়েছিলেন অসংখ্য মুসলিম ও ইহুদি পণ্ডিত ব্যক্তি। এক সময় আরব থেকে উত্তর আফ্রিকা ও পারস্য থেকে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত মুসলিম সাম্রাজ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় জোয়ার এসেছিল। এসময় মুসলিম জ্ঞান সাধনায় প্রাচীন গ্রিসের গ্রন্থরাজির সন্ধান কাজ ও অনুবাদ শুরু হয়। এই সংযোগ ইতালির উদীয়মান জ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে সাড়া জাগায়। ইতালীয় রেঁনেসা শিল্প ও সাহিত্যে জাগরণ ও বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

ইতালির শিক্ষাকেন্দ্রগুলো কেবল ধর্মশিক্ষার রীতি বাতিল করে পার্থিব জ্ঞান, বিজ্ঞান, দর্শন শেখাতে শুরু করে। রেনেসাঁ যুগে এমন কয়েকজন বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, চিন্তক ও শিল্পীর আগমন ঘটে যাঁরা শুধু ইউরোপ নয়, সমগ্র মানব সভ্যতার ইতিহাসকে তাঁদের চিন্তা ও কর্ম দিয়ে প্রভাবিত করে গিয়েছেন। জ্ঞান ও আলোর পথে অগ্রসর হতে সাহায্য করেছেন। রেনেসাঁ যুগের দু'জন বিখ্যাত বিজ্ঞানী হলেন, কোপার্নিকাস এবং গ্যালিলিও। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষ মনে করত, পৃথিবী হচ্ছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু। চন্দ্র, সূর্যসহ সকল গ্রহ-নক্ষত্র পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। প্রাচীন বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থেও এই কথা বলা হয়েছে। রেনেসাঁ যুগের বিজ্ঞানীরা এই ধারণাকে ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করেন এবং পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে ইতিহাসের এই সত্য আবিষ্কার করেন। রেনেসাঁ যুগের দু'জন বিখ্যাত চিত্রশিল্পী হলেন, লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি এবং মাইকেল এঞ্জেলো। লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চিকে এখনো সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পীদের একজন বলে বিবেচনা করা হয়।

উপরে ছবিতে বাঁম দিকে রেনেসাঁ যুগের বিখ্যাত চিত্রশিল্পী লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি।
বামে ভিঞ্চির আঁকা বিখ্যাত চিত্রকর্ম 'মোনালিসা'

রেনেসাঁ যুগের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে জাতিরাষ্ট্রের উত্থান। পনেরো শতক থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন শক্তিশালী রাজশক্তির হাত ধরে জাতিরাষ্ট্রের উত্থান ঘটে। জাতিরাষ্ট্রের রাজাগণ বাণিজ্য বিস্তারে সহায়তা করেন। স্পেন, পর্তুগাল, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশের নাবিকেরা সমুদ্রযাত্রায় যে দক্ষতা অর্জন করেছিলেন তার ওপর ভিত্তি করেই আবারও জাহাজ যোগে দক্ষিণ এশিয়া এবং ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের উদ্যোগ নেন। ১৪৯৮ সালে পর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামা আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল হয়ে ইউরোপ থেকে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার করেন। অন্যদিকে ইতালির নাবিক কলম্বাস স্পেনের রাণী ইসাবেলার কাছ থেকে অর্থসহায়তা নিয়ে ভারতে আসার নতুন জলপথ আবিষ্কার করতে গিয়ে ১৪৯২ সালে আমেরিকা মহাদেশে পৌঁছে যান। ইউরোপ এবং এশিয়ার মানুষের কাছে আমেরিকা মহাদেশ সম্পর্কে তখন অবধি কোনো তথ্যই ছিল না। আটলান্টিক মহাসাগরের অগাধ জলরাশি মধ্যখানে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কলম্বাসের দেখানো পথ ধরেই স্পেনীয়রা আমেরিকার নির্দিষ্ট কিছু অংশে সাম্রাজ্য স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এরপর একে একে পর্তুগিজ এবং ইংরেজ নাবিক এবং বণিকেরাও নতুন মহাদেশটিতে অভিযান পরিচালনা করে নিজেদের দখল প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চালায়। অল্প দিনের মধ্যেই আমেরিকার স্থানীয় আদি অধিবাসীদের বিরাট সংখ্যক মানুষকে যুদ্ধে পরাজিত ও বিতাড়িত করে ইউরোপীয় শক্তিগুলো নতুন মহাদেশের ভূমি এবং সোনারুপা দখল করে ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থা চালু করে।

শুধু আমেরিকায় নয়, জলপথ আবিষ্কারের এই সূত্র ধরেই এ সময় ভারতীয় উপমহাদেশ সহ সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশেও ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর কলোনি বা ঔপনিবেশিক শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলত বিভিন্ন ধরনের খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদ এবং নতুন ভূমির ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্যই ইউরোপের রাজশক্তিগুলো এশিয়া, আফ্রিকা, আমেরিকা মহাদেশের বিস্তৃত এলাকাজুড়ে ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনা করে। এসবভৌগোলিক আবিষ্কার এবং উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার ফলে ভিন্ন ভিন্ন দেশ এবং মহাদেশের মানুষের মধ্যে সংযোগ ঘটে। এই সংযোগ ধীরে ধীরে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনেও প্রভাব বিস্তার করে। আমেরিকা, আফ্রিকা, এশিয়ার দেশগুলোতে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা, দর্শন, স্থাপত্যরীতি প্রবেশ করে। সামাজিক নানান প্রথা, বিশ্বাস এবং আচার-অনুষ্ঠানেও ইউরোপীয় রীতিনীতির প্রচলন হতে দেখা যায়।

শিল্পবিপ্লব

ইতিহাসের বিভিন্ন কালপর্বে ঘটে যাওয়া যেসব ঘটনাবলি মানুষের জীবনে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করেছে শিল্পবিপ্লব সেগুলোর মধ্যে অন্যতম। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লব শুরু হয় । কৃষি এবং শিল্পক্ষেত্রে মানুষের পরিবর্তে যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হয় এই বিপ্লবের মধ্য দিয়ে। আদিকাল থেকেই মানুষ নিজের শ্রম দিয়ে সকল কাজ করত। চাষ ও মালামাল পরিবহণে পশু এবং পালতোলা জাহাজ ব্যবহার করত। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের সময় মানুষ প্রথম এই শ্রমক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে যন্ত্রের ব্যবহার শুরু করে। এই সময় ইংল্যান্ডে বাষ্পচালিত স্টীম ইঞ্জিন আবিষ্কৃত হয়। এই ইঞ্জিনকে কাজে লাগিয়ে নির্মিত হয় বড়ো বড়ো ফ্যাক্টরি ও শিল্প কারখানা। ফলে উৎপাদনক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়। শুধু শিল্প নয়, কৃষিক্ষেত্রেও যন্ত্রের ব্যবহার শুরু হয় এই শিল্পবিপ্লবের সময় হতেই। কৃষিক্ষেত্রে সার প্রয়োগ, যন্ত্রের মাধ্যমে বীজ বপন, উন্নতমানের পশু এবং খাদ্যশস্য পৃথক করে নতুন প্রজননপদ্ধতি আবিষ্কার, খামার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে পশুপালন প্রভৃতি আধুনিক প্রক্রিয়া যুক্ত হয় কৃষিক্ষেত্রে। ফলে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার সঙ্গে তাল মিলিয়ে খাদ্য উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব হয়। এশিয়া এবং আফ্রিকায় ইংল্যান্ডের উপনিবেশ থাকায় শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল তারা এসবউপনিবেশ থেকে সংগ্রহ করত। আবার শিল্পবিপ্লবের ফলে যে প্রভূত পণ্য উৎপাদিত হচ্ছিল সেগুলো বিক্রি করার ক্ষেত্রও ছিল উপনিবেশগুলো। শিল্পবিপ্লবের সূচনা ইংল্যান্ডে হলেও ধীরে ধীরে তা ইউরোপসহ পৃথিবীর

অন্যান্য অনেক দেশেই ছড়িয়ে যেতে শুরু করে। এর ফলে শিল্পকে উপজীব্য করে বড়ো বড়ো আধুনিক নগর গড়ে উঠতে শুরু করে।

নৌকা, জাহাজ, রেলগাড়ি, মোটরগাড়ি প্রভৃতি যানবাহনেও প্রথমে বাষ্পচালিত এরপর তেল ও বিদ্যুৎ চালিত ইঞ্জিন বসানো হয়। এরফলে সভ্যতার বিকাশে নতুন এক গতির সঞ্চার হয়।

মানব সভ্যতা খুব দ্রুতই যন্ত্র ও প্রযুক্তি নির্ভর জীবনব্যবস্থার দিকে ধাবিত হয়। বর্তমান পৃথিবীতে মানুষের জীবনের সঙ্গে এই যন্ত্র ও প্রযুক্তির তৈরি হয়েছে অকাট্য এক সম্পর্ক। কৃষি, শিল্প, বিনোদন, পরিবহণ, নির্মাণ প্রভৃতি প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই এখন যন্ত্রপ্রযুক্তির রয়েছে অবাধ ব্যবহার। এই শিল্পবিপ্লবের ঢেউ ভারতীয় উপমহাদেশেও ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে। বাংলা অঞ্চল এবং বাংলাদেশেও এর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়।

চতুর্থ শিল্পবিপ্লব

বাষ্পীয় ইঞ্জিন আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে যে বিপ্লবের শুরু হয়েছিল বিদ্যুৎ শক্তির আবিষ্কারের ফলে তা আরও একধাপ এগিয়ে যায়। যাকে বলা হয় দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লব। উনিশ শতকের মধ্যভাগে শুরু হয় তৃতীয় শিল্প বিপ্লব। এই বিপ্লবের প্রধান অবদান হচ্ছে, কম্পিউটার এবং ইন্টারনেটের ব্যবহার। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগকে ডিজিটাল প্রযুক্তি বা তথ্যপ্রযুক্তির যুগও বলা হয়ে থাকে। তথ্য প্রযুক্তির সঙ্গে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার শুরু হওয়া সঙ্গে সঙ্গে মানব সভ্যতা চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের যুগে প্রবেশ করেছে। চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের শুরু হয়েছে গত শতাব্দীর শেষ দশকে। অল্প দিনের মধ্যেই তা মানব সভ্যতার নানান ক্ষেত্রে নিয়ে এসেছে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন। ভার্চ্যুয়াল রিয়েলিটি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন যন্ত্রপাতি, চালকবিহীন গাড়ি, ড্রোন, কৃত্রিম উপগ্রহ, ন্যানোপ্রযুক্তি, কোয়ান্টাম কম্পিউটিং প্রভৃতি হচ্ছে চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার উন্নয়নের ফলে যন্ত্রের সহায়তায় জিনপ্রকৌশল থেকে শুরু করে মহাবিশ্বের নানান প্রান্তে অভিযান পরিচালনা করছে। ইতিহাসের সকল অভিজ্ঞতাকে ধারণ করে বর্তমানে চতুর্থ শিল্পবিপ্লব মানুষকে পরিকল্পিতভাবে সামনের দিকে পরিচালিত করছে। জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক উন্নতির ফলে মানুষ এখন নানান বৈচিত্র্যের মধ্যেও একতার সূত্র খুঁজতে শুরু করেছে। সমগ্র বিশ্বের নানান প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা নানান ধরনের সমাজ ও সংস্কৃতি, স্বতন্ত্র জীবনধারার গল্প ইন্টারনেটের মাধ্যমে অডিও, ভিডিওসহ নানান বিন্যাসে চিত্রায়িত ও ধারণকৃত হয়ে ইন্টারনেটের মাধ্যমে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে। ফলে মানুষ নিজের সমাজ ও সংস্কৃতি লালন করার পাশাপাশি ভিন্ন ভূমি, ভিন্ন ভিন্ন ধারার সামাজিক প্রথা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করছে। আবার অনেক ক্ষেত্রে একজন অন্যজনের সংস্কৃতির পুরোটা অথবা অংশবিশেষ গ্রহণও করছে।

এভাবেই বৈচিত্র্যের মধ্যে স্থাপিত হচ্ছে ঐক্য, বৈশ্বিক পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বজনীন ঐক্য। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে বসবাসকারী মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতি গঠন ও রূপান্তরের অভিজ্ঞতা এখন সহজেই সকল মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব হচ্ছে। সমাজ-সংস্কৃতির প্রবাহমানতা এবং গতিশীলতা এখন বেড়েছে। বিজ্ঞজনেরা বলেন, গোটা পৃথিবীটাই এখন একটা গ্রামে পরিণত হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধের সময়ে এলাকায় সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন এবং এলাকার মানুষের অবস্থান ও ভূমিকার ওপর প্রভাব অনুসন্ধান

আমরা এই শিখন অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জানতে পেরেছি যে যেকোনো সময়ে যেকোনো ধরনের সামাজিক/ রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন সেই এলাকার মানুষের অবস্থান ও ভূমিকার ওপরে প্রভাব ফেলে। এখন আমরা সেই ধারণাকে কাজে লাগিয়ে মুক্তিযুদ্ধের সমসাময়িক সময়ে আমার এলাকায় সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের কী কী পরিবর্তন হয়েছিল এবং তখন এলাকার মানুষের অবস্থান ও ভূমিকা কেমন ছিলো তা অনুসন্ধান করে বের করব।

- প্রথমে আমরা অনুসন্ধানের জন্য একটি প্রশ্নমালা তৈরি করবো। নিচে একটি নমুনা দেওয়া আছে। এটির মতো করে তারা দলে বসে আলোচনা করে আমাদের প্রশ্নমালা চূড়ান্ত করব।

প্রশ্নমালা

১. মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমাদের এলাকার মানুষের পেশার কী কোনো পরিবর্তন হয়েছিল? হলে কেন?

২. মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমাদের এলাকায় অবকাঠামোর কোনো পরিবর্তন হয়েছিল কী? হলে কী ধরনের পরিবর্তন ও কেন?

৩. মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমাদের এলাকা পরিচালনার জন্য কোনো রাজনৈতিক বদল হয়েছিল কী? হলে এ পরিবর্তন মানুষের ওপর কেমন প্রভাব ফেলেছিলো?

৪. **মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময় আপনার পরিবারের খাদ্য চাহিদা কি ঠিকমত মেটাতে পেরেছিলেন?**

৫. **মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমাদের এলাকার শিক্ষাক্ষেত্রে কোনো পরিবর্তন এসেছিল কী?**

৬. **মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমাদের এলাকার চিকিৎসা ব্যবস্থা কেমন ছিল?**

৭. **মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমাদের এলাকায় গণমাধ্যম কী রকম ভূমিকা রেখেছিল?**

৮. **মুক্তিযুদ্ধের সময়ে আমাদের এলাকার কোনো পরিবার কি ঘরবাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিল?**

এরপর প্রশ্নমালা ব্যবহার করে নিজ পরিবার ও এলাকার বয়স্ক মানুষদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে দলীয়ভাবে প্রতিবেদন/ পোস্টার তৈরি করে উপস্থাপন করব।